কবি ভাস্কর চক্রবর্তী

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

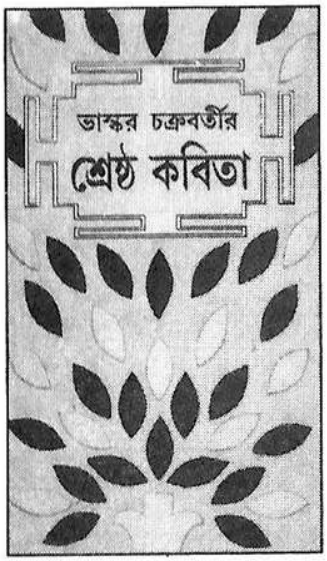

ভাস্কর চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৯
চতুর্থ সংস্করণ : আগস্ট ২০১৯
প্রচ্ছদ : মিলন বন্দ্যোপাধ্যায়
দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
২৫০ টাকা

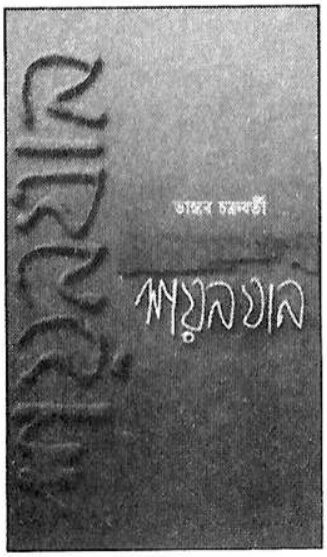

শয়নযান
ভাস্কর চক্রবর্তী
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
তৃতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১৫
প্রচ্ছদ : রাতুল চন্দরায়
উর্বী প্রকাশন ২৮/৫ কনভেন্ট রোড
কলকাতা ৭০০০১৪
৬০ টাকা

ঘটনাহীন ঘটনাহীন মস্ত ঘটনাহীন তোমার জীবন

প্রায় পনেরো বছর হতে চলল, আপাদমস্তক কবি ভাস্কর চক্রবর্তী, আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তারও অনেক অনেক আগে, হঠাৎই চলে গিয়েছিলেন সুব্রত চক্রবর্তী। ভাস্কর এবং সুব্রত প্রায় একই সঙ্গে, একই সময়ে কবিতা লেখা শুরু করেন। তখন চলছে— বাংলা কবিতার আসর জুড়ে, সুনীল-শক্তি ও অন্যান্যদের প্রভুত বিক্রম। *কৃত্তিবাস* পত্রিকার মাধ্যমে সুনীল-শক্তি-উৎপলরা বাংলা কবিতার প্রায়-নিথর, ঘোলা জলের মাঝখানে ঘটিয়েছিলেন নতুন ভাষার, নতুন বীক্ষার, দুঃসাহসিকতার, বেলেল্লাপনার, যৌনতার, জীবনকে সাড়ম্বরে অস্বীকার করার— এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ।

এঁদের মাঝেই, ভয়ডরহীন, ভাস্কর-সুব্রতরা কখন যেন, প্রায় সকলের অলক্ষে কবিতার রণরোল-এর মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন নিজেদের অনন্য স্টাইল এবং জানাবার মতো কিছু কথা নিয়ে।

ভাস্করের প্রথম কাব্যগ্রন্থ— *শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা* (প্রকাশিত ১৯৭১) চিনিয়ে দিয়েছিল এক রোমান্টিক, স্বপ্ন সন্ধানী, এলোমেলো জীবনযাত্রার নিঃসঙ্গ যুবককে; যার ঘোষণা ছিল— 'আমাদের স্বর্গ নেই স্যারিডন আছে', 'সমস্ত রাস্তা জুড়েই সাদা বিছানা পাতা তোমার জন্যে', 'বছরের প্রথম দিনেও তুমি ঘুরে বেড়িয়েছ একা একা/ বছরের শেষ দিনেও তাই', '... রাত দুপুরে মানুষের জানালায় উঁকি মেরে দেখেছি আমি/ খোলা শরীরের ওপর, খেলা করছে, খোলা শরীর/ হলুদ বিছানা, ভেসে চলেছে স্বর্গের দিকে', 'ঝরে পড়ছে নক্ষত্র, শব্দ নেই, শুধু মানুষ/ মাদুর পেতে শুয়ে রয়েছে বারান্দায়/ মশা মারছে/ বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমি...', এঁকেছিলেন, সেই কবে, ১৯৭০-এ সম্ভবত; এরকম এক অনির্বচনীয় জাদুবাস্তবতার ছবি— 'শুধু একটু আলপিন, আজ সমস্ত রাত, দোল খাবে হাওয়ায়/ শুধু একজন মানুষ, আজ সমস্ত রাত, খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে থাকবে'। অকপটে, ভাস্কর, জানিয়েছিলেন এরকম এক ইচ্ছের কথা— 'এক হাজার পাখির মধ্যিখানে/ বসে থাকতে ইচ্ছে করে দুপুরবেলা— সত্যি/ দুপুরবেলা, আরও কত কী করতে ইচ্ছে করে— হলুদ শাড়ি পরে/ যখন তুমি দাঁড়িয়ে থাক বারান্দায়'।

স্বভাবগতভাবেই কি ভাস্কর ছিলেন ঘোর বিষণ্ণতাবাদী? সারাজীবন তিনি শুধু ভেবে গেছেন অসুখের কথা, ফাঁকা জীবনের কথা, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর কথা। কষ্ট করে একাকিত্বের চিত্রকল্প তাঁকে নির্মাণ করতে হয়নি; ভালোবাসতেন প্রতিটি মুহূর্ত; আর তাই তাঁর কবিতায় আমরা একের পর এক পেয়ে যাব এরকম সব অসাধারণ উচ্চারণ : 'সাতবছর, আমি একটা ভুতের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি কলকাতায়/ আমার হাত ছিল না, পা ছিল না/ আমার বই আমি আর বিক্রি করব না কোনোদিন/ আমি এখন ভুলে যেতে চাই সবকিছু/ আমি বেঁচে থাকতে চাই তোমাদের সঙ্গে, জয়হিন্দ'। বেশ উল্লসিত স্বরে জানান কবি, 'শুধুই পায়চারি-ভর্তি জীবন ছিল আমার। আর ছিল, রাংতায়-মোড়া, নতুন-নতুন সব ট্যাবলেট।' ...মৃত্যু? ...হ্যাঁ, মৃত্যুকেও তো ছেড়ে কথা বলেননি ভাস্কর! জানিয়েছেন— '...আমার সমস্ত লেখালেখির ভেতর মৃত্যু তার ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।' সেইসূত্রে বলা যেতে পারে ভাস্করের প্রায় সমস্ত কবিতাই আত্মজৈবনিক। কবিতায় তাঁকে বানিয়ে বলতে হয় না কিছুই। তাঁর কবিতায় শুধুই কথা বলে যায় ভুতগ্রস্ত, মাদক বা মদ্য-আক্রান্ত এক যুবক; যে 'লিফ্‌টে চেপে', '...দুঃখকে নিয়ে', ঢুকে পড়েছে দশতলার ফ্ল্যাটে।

লিখে ফেললাম ঘোড়া, মৃত্যু, নদীর কথা/ অসুখের কথা/...

যতদূর জানি, অসংখ্য কবিতা-রচনা ছাড়াও, ভাস্কর দুটো যৎসামান্য গদ্য-গ্রন্থ লিখেছিলেন। একটার নাম— *প্রিয় সুব্রত* (এক ফর্মা); ও আর একটা— *শয়নযান*। এটিও একটা তিন-ফর্মার বই। ভাস্করের কথায় : 'ব্যক্তিগত হাওয়া'য় ঝিম মেরে আছে'— এই দুর্লভ গদ্যগ্রন্থ। কবির বিষয়ে কোনো রচনাতেই প্রায় এই *শয়নযান*-এর উল্লেখ খুব একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু এই কবির রহস্যময় অন্তরাত্মা বুঝতে হলে, আমার মনে হয়েছে, এই বইটির ভূমিকা অমূল্য। আত্মজৈবনিক এই গদ্যগ্রন্থ থেকে আমি পরপর কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই, যা ভাস্করের কবি-মানসিকতাকে বুঝতে হলে জানা প্রয়োজন বলে মনে হয়—

১. 'আমি কবিতা লিখি কিন্তু আমি কবি নই। হতে পারতাম কোনও খেলোয়াড়।' এইসূত্রে মনে পড়ে যেতে পারে সেই কবিতার লাইনটি— 'সাদা জামা-প্যান্ট, কত প্রিয় ছিল আমার...'— মানসচক্ষে দেখি একজন ক্রিকেট-খেলোয়াড়ের ছবি।

২. 'আমার ছিল গোপন এক ব্যক্তিগত মৃত্যুবোধ।'
ভাস্কর-রচিত দুটি কবিতার কথা মনে পড়ে যায়।
একটির শিরোনাম— 'এক মূর্খের সম্মানে'।

এইখানে, মূর্খ এক, তার
অসুখী জীবন নিয়ে খেলা করেছিল।

ছাদে, তার রক্তিম পাজামা পড়ে আছে—
ঘরে-বাথরুমে, তার
পড়ে আছে হাত ও পায়ের কসরত—

এইখানে, এখানে-সেখানে— রক্ত, আর
মোজা, আর
শুধু জলের দাগ

থেমে আছে কবেকার ছিন্নভিন্ন হাসি।

'এপিটাফ' কবিতাটিও কি মনে পড়ে?

দুই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যিখানে, মৃত্যু, আমি তোমাকে
জন্মাতে দেখেছি

৩. 'তাসের আড্ডায় বসে থাকতে থাকতে আমি দেখেছি সময়
কিরকম ঈগলপাখির ডানার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।'

তাস খেলার প্রসঙ্গ এলেই আমাদের হয়তো মনে পড়ে যাবে সেই 'এই যে আমরা'

কবিতাটি। কিছু লাইনের উদ্ধৃতি :

এই সেই গলি যেখানে আমার বাপ-কাকারা বেঁচেছিলেন
আমাদের ছেলে-ছোকরারাও
এই গলিতেই তাস পিটবে প্রেম করবে আর ধুপধাপ দৌড়োবে রাতদুপুরে
বিতিকিচ্ছিরি ভুলভাল এই গলিটা আমাকে আপাদমস্তক জড়িয়ে আছে
আপনার কি মনে হয় না
ইতিহাস এসে এই গলিতেই ছাতামাথায় দাঁড়িয়ে পড়বে একদিন

'আমার জীবনের প্রতিটি চেষ্টাই বোধহয় মৃত্যু থেকে শুধু জীবনের দিকে যাওয়ার।' কবিতাতেও বার বার একই কথা বলেছেন ভাস্কর। বলেছেন— 'মৃত্যু এসে কবিতার ভাষা উপহার দিয়ে যায় আমাকে/ আর জীবন ঢেলে দেয় রঙ।' 'সংকেত' কবিতাতেও মৃত্যু-ভয়হীন কবি বলেন— 'কথা বলি নিজের ভাষায়/ ভয় নেই মৃত্যু-অতিথিকে/ মায়াবী শহরে ঘুরি-ফিরি/ তবু আমি নীল সমুদ্রের।' আর প্রসঙ্গক্রমে— 'মৃত কবিবন্ধুদের জন্যে' কবিতাটি স্মরণ করতেই হবে আমাদের :

মৃত কবিবন্ধুদের প্রতিনিধিত্ব করি আমি।
আমি কলকাতায় থাকি।
বরানগরে।

প্রত্যেকের সঙ্গেই
সুন্দর একটা যোগাযোগ আছে আমার এখনো।

মানিকের সঙ্গে চিঠিচাপাটি চলে
শামশেরের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা হয়
খবর নিয়েছি, সুব্রতর আর ওষুধপত্রের দরকার হয় না
'মারহাব্বা', তুষার জমিয়ে ফেলেছে ওখানকার আড্ডা।

আমি প্রতিদিন খবর নিই ওদের
ওদের কথাবার্তা এখনো মন দিয়ে শুনি।

ওদের একটাই অনুরোধ শুধু আমি কিছুতেই শুনি না
শুনতে চাই না এত তাড়াতাড়ি :

চলে আয়।

'মহান হতে চাওয়ার একটা ধান্দা শুধু মাঝে-মধ্যে আমাকে পেয়ে বসে। আমার এই গোলমেলে ইচ্ছেটাকে এবার একটু ছেঁটে দিতে হবে।'

নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেও ভাস্কর একই কথা লিখেছেন; বরং সেখানে হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস আরও তীব্র।

> সারাজীবন একটা ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে, আজ দেখি, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমি প্রায় কিছুই করিনি, শুধু কবিতা লেখা ছাড়া। বাংলা কবিতা নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করব, আমার এরকম একটা ইচ্ছে ছিল কমবয়স থেকেই। সেটা বোধহয় স্বপ্নই থেকে গেল।

কবিতাতেও তো সেই একই দীর্ঘশ্বাস? 'আর আমি লিখতে চেয়েছিলাম, লড়িয়ে দিয়েছিলাম নিজেকে। আমার সেই কবিতাগুলো আজ কাত হয়ে পড়ে আছে।'

শয়নযান-এ ৫১ পৃষ্ঠায় কবি লিখছেন :

> আমার লেখালেখি, তবুও, সুমন্ত, স্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হেরেই গেলাম হয়তো। বাহান্ন চলছে। কোনও স্বীকৃতিই জুটল না।

কবির এই নিষ্করুণ মর্মবেদনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কৃত্তিবাসী গোষ্ঠীর পর একমাত্র ভাস্কর চক্রবর্তী লিখেছেন— এমনই অলৌকিক কবিতা যা বাংলা-কাব্যের মান-কে আন্তর্জাতিকতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের এই হাড়-হাভাতে, মূর্খের দেশে কে পড়ে ভাস্করের কবিতা, বিশেষত তিনি যখন নিজের ঢাক পেটাতে ছিলেন সারাজীবন অপারগ। ইতোমধ্যে গঙ্গার জল কতই না ঘোলা হয়েছে। অশুদ্ধ, অ-কবিরা অকাদেমি পর্যন্ত পেয়ে গেছে। কিন্তু এই আনখশির কবির জন্যে— মৃত্যু-পরবর্তী রবীন্দ্র-পুরস্কারের কথাও কী ভাবা যায় না? সারাজীবন এই অবিচারের জন্যে শুধু কবিতাই লিখে গেছেন ভাস্কর, জানিয়েছেন—

> মুক্ত কবিতার জন্যে বসে আছি
> স্বপ্ন বিস্তারের জন্যে বসে আছি
> কী ভাবো আমাকে তুমি? কলের পুতুল?
> বাঘের মুখের মধ্যে বসে আমি
> তিন খাতা চার খাতা
> কবিতা লিখিনি?

৬. 'সারা পৃথিবীটাই কবিতা দিয়ে তৈরি।'

'ঢেউ' কবিতার আংশিক উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে হয়তো ভাস্কর শুধু *শয়নযান* গদ্যগ্রন্থে নয়, নিজের রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপগুলিতেও বলেছেন একই কথা :

> প্রতিদিন, কী বিষণ্ণ মজার এক খেলা চলেছে পৃথিবীতে— মাঝরাত্তিরে, আমি বাড়ি ফিরে দেখি দু-চারটে আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে শুকনো রুটিতে

যে কোনো কৌটোয় নিশ্চয় চিনি...
কেন যে মরতে ছুটেছিলাম আমি গত বছর, ভেবে অবাক হই,
'মেয়েরা, ইস্পাতের প্রজাপতি'
শুঁড়িখানায় আমাকে একদিন বলেছিলেন এক দাদাসাহেব

'হে জীবন' কবিতায় ভাস্কর লেখেন :

ছুঁয়ে যাই বিপজ্জনক
নেশা আর কালো দিনরাত
ছুঁয়ে যাই মা-র পা দু'খানি
ছুঁয়ে যাই পিতার দু'হাত।
ছুঁয়ে যাই তোমার দু'চোখ
ছুঁয়ে যাই হারমোনিয়াম
ছুঁয়ে যাই ব্যর্থ এ জীবন
হে জীবন তোমাকে প্রণাম।

আর 'স্থিরচিত্র' কবিতাটি তো বিশ্ব-কবিতার তেপান্তরে এক দুর্মূল্য লজ্জাবতী গাছ :

গাছ আর
গাছের ছায়ার নিচে দড়ির খাটিয়া

আমাদের তৃতীয় পৃথিবী

শয়নযান-এর ৩৪ পৃষ্ঠায় ভাস্কর প্রশ্ন রাখেন নিজের কাছেই :

> কবিতা কি স্তব্ধতার ভাষা? কবিতা কি জানার মাঝে অজানাকে সন্ধান? জীবন আর মৃত্যুর আলোছায়াময় খেলা? কবিতা কী, আচ্ছা, আমি বলছি। আলোয় ভর্তি একটা পাহাড়, যে আলো শুধুই হাজার মোমবাতির। মোমবাতিগুলো সব জ্বলছে, আর পাহাড়টা আস্তে আস্তে ডানা ভাসিয়ে শূন্যে উড়ছে, আর ভেসে যাচ্ছে। কবিতা আমার কাছে ঠিক এইরকম। আলোয় সাজানো একটা পাহাড়ের ভেসে যাওয়ার মতো।

আর কয়েক লাইন পরেই সেই অনপনেয় উচ্চারণ।

> কবিতা মহাকাশের মতোই রহস্যময়। যে যুগই পৃথিবীতে আসুক না কেন, কবিতা তার নিজস্ব পথ তৈরি করে নেবে। মহাকাশে চলতে চলতেও মানুষ একদিন কবিতা পড়বে।

রহস্যময় কবিতা কি লিখেছেন ভাস্কর? তাঁর কবিতা মানেই কি শুধু অসুখ-বিসুখ, রঙিন ট্যাবলেট, ঘুসোঘুসি, জনহীন নির্জন রাস্তা, নির্জন ছাদে কোনো মহেঞ্জোদরো-মেয়ে কিংবা বিপন্নতা, যা বিশাল পাখির মতো ডানা ঝাপটায় মুখে। কিন্তু *দেবতার সঙ্গে* কাব্যগ্রন্থে, আমার ধারণা, ভাস্কর তাঁর কল্পনার গতিমুখ ও কাব্যভাষা বদলে ফেলতে পেরেছেন।

উদ্ধৃত কবিতাটির থেকে আরও রহস্যময় কোনো কবিতা হতে পারে? তিনটি টুকরো উদাহরণ :

ক. দেবতা আমাকে ফেলে সন্ধেবেলার ট্রেনে দেরাদুন গেছেন।
আমি একা ছোটো ঘরে থাকি— ফলে আলো
পড়ে না শরীরে, মনে— আমিও শহরতলি ফেলে রেখে
ভাঙা এ শহর থেকে যেতে চাই পাহাড়ে বা সমুদ্রবাতাসে।
দেবতা চুরুট হাতে আমার সমস্ত কথা শুনে হেসেছেন।
'যদিও শেরিফ নও তুমি'— তিনি বলেছেন, 'ধ্বস্ত ও শহর
দেখাশোনা করো তুমি'— আমার দায়িত্ব নাকি অনেক; শুনেছি।
আমি চাই মিশে যেতে প্রতিটি জলের সঙ্গে— অথচ দেবতা
নারাজ, উধাও ফের— আমি আরো ফাঁকা ঘরে শান্ত শুয়ে আছি।

খ. গড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় যেতে চেয়েছিলাম আমি? কোন্ গ্রামে, পাহাড়ে, কোন্ রাজবাড়িতে?

... ...
আততায়ী আর নিহতের মধ্যবর্তী শূন্যতা যখন গমগম করছে, চাবুকরানী
ফ্যানটা বন্‌বন্ ঘুরছে আমি লিখতে চাইছি নতুন কিছু আর
দেখছি আমার মাথাটা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ায়... যখন
আমার ঘুম পাবে আমি ভাবনাটা

ভাঁজ করে রেখে দেব মাথার পাশে— ওস্তাদ, বিষ নেই এমন কোনো
মানুষ, আমরা কি আর খুঁজে পাবো না শহরে?

গ. হাতঘড়ির উপরে আজ শুকনো একটা দুব্বোঘাস কাঁপছে সব থেকে
প্রতিভাবান মেঘটি ছায়া দিচ্ছে এখন
মাস্টারমশাই আমার কথাগুলো সারাবছর আমি টেবিলে সাজিয়ে বসেছিলাম
ঈশানীপাড়ার সেই মেয়েটির সঙ্গে কেন দেখা হবে না
কেন কথা হবে না আমার
তিস্তা আর মহানন্দার পাশে আমি আবার একদিন যাবো কুড়িয়ে আনবো
আমার প্রিয় মুখগুলো
নীলিমা কেবিন তখন হাওয়ায় ভাসছে যদি রুমাল থাকে আপনার মুখটা
মুছে নিন একবার
ফুটপাতে কে আজ বুক-ছেতরে পড়ে আছে ওই মাথায় কি স্বপ্ন
ছিল না কোনো ওই রক্ত কি শুধুই মিশে যাবে গঙ্গায়
ওঠো হে ছোকরা জম্পেশ একটা গান ধরো স্যাঙাতকে ডাক এবার বাঁশি
বাজাবার জন্যে

আমার কারবার আমি মৃতদের জাগিয়ে তুলি আর নিমেষে
কথাবার্তা শুরু হয় আবার...

জিরাফের ভাষা

ভাস্করের মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা— দশ। *জিরাফের ভাষা*— শেষ কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলির রচনাকাল— ১৯৯৭-২০০৪। প্রকাশ— ২০০৫। কবিতাগুলির প্রত্যেকটিই তাঁর অসুস্থ শরীরের, দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ। আমরা বলতে পারি কবিতাগুলি হল— 'Spontaneous Overflow of powerful emotions...'। *শয়নযান* গদ্যগ্রন্থে ভাস্কর জানিয়েছেন যে, তিনি মৃত্যুর কথা ভাবেন না, তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকতে চান জীবনকে; যে জীবন হল— 'কোথাও সানাই বেজে চলেছে এখন/ মানুষেরা বাড়ি ফিরছে সুখ-শান্তি চেয়ে।' অনেক কবিতাতেই তিনি জানিয়েছে— 'আজো আমি বেঁচে থাকতে চাই।' জিজ্ঞেস করেছিলেন নিজেকেই— 'কী খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি সমস্ত জীবন?/ ভালোবাসা শুধু।' প্রেমের স্মৃতিচারণ করেন এভাবে— 'পঁচিশ বছর আগেকার/ মুখ যেন জাপানী অক্ষর/ বাজুবন্ধ মৃদু বেজে ওঠে/ গান গান গান শুধু গান/ ছোটো এক ঘরে শুয়ে আজ/ মনে পড়ে প্রেমিক ছিলাম।' অসুস্থ ভাস্কর লেখেন— 'আমারও তো কথা বলা বন্ধ আর সিগারেটও বন্ধ/ বড়ো এক ডাক্তার বলেছে : বেঁচে যাবো—/ বেঁচে যাবো বেঁচে যাবো ভাবি শুধু...'।

'জিরাফের ভাষা' কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে ব্যাধির তীব্র যন্ত্রণা এবং বেঁচে থাকবার টান-ভালোবাসা—

ক. এই কেনাবেচার শহরে/ আমাকেই পুড়তে হবে রাত্রিদিন— আমাকেই মরতে হবে শুধু!

খ. আরো একটু চেষ্টা করি সুমঙ্গল, এসো বাঁচি, বেঁচে থাকা যাক।

গ. আজ সামনে পথ নেই অন্ধকার চেঁচামেচি অন্ধকার প্রেম ভালোবাসা/
... অন্ধকারের সঙ্গে কথা বলছি অন্ধকারে বসে—

ঘ. একটা আগ্নেয়গিরি ধোঁয়ার মতন গিলে উল্টে শুয়ে আছি/ অনেক টক্কর হলো তোমাতে-আমাতে আর গান হলো হাজার খানেক

ঙ. যে দিন এসেছে তাকে বুঝে নাও, তার সঙ্গে বসবাস করো।/ কেন মানব এই সব দিনরাত? এই সব দিনরাতগুলো?/ আকাশে আগুন ঝরছে ততধিক আগুন বাতাসে/ নাচো চণ্ডালিনী নাচো/ মাতৃরক্তে পিতৃরক্তে আমরা আজ রক্তধারা, রাক্ষসীসময়ে।

চ. এতটা অসহনীয় এতটা তিরিক্ষি, জেদি, পৃথিবী কি ছিল কোনোদিন?/ যে আগুনে পুড়বো আমি, সে আগুন, কিছুটা আলাদা করে/ বইয়ের পাতার মধ্যে সরিয়ে রেখেছি—

সম্ভবত তাঁর শেষ উচ্চারণ :

এইসব সারেগামা পেরিয়ে তোমার কাছে দু-ঘণ্টা বসতে ইচ্ছে করে।
আমার তৃতীয় চোখ হারিয়ে গিয়েছে।
সিঁড়ি দিয়ে যে উঠে আসছে আজ আমি তার মুখও দেখিনি।
তোমাকে দুঃখিত করা আমার জীবনধর্ম নয়
চলে যেতে হয় বলে চলে যাচ্ছি, নাহলে তো, আরেকটু থাকতাম।

মৃত্যু কীরকম? তা মৃত্যু-আঁধারের যাত্রী এই জীবনবিলাসী কবি সম্ভবত লিখে গেছেন *শয়নযান* গদ্যগ্রন্থের শেষ গদ্যচূর্ণটিতে।

ধুলিমুখোশ পরা একটা লোক আমার সামনে দিয়ে উড়ে যেতে যেতে বলল : চললাম। যে কবিতাটা আমি লিখছিলাম, কোথায় আরম্ভ হয়েছিল আমি ভুলে গেছি, কোথায় শেষ হবে তাও আমি জানি না। রাজ্যের সইসাবুদগুলো এখন উড়ে চলেছে, করমর্দনগুলো ধন্যবাদগুলো উড়ে চলেছে। চীনেমাটির পুতুলগুলো উড়তে উড়তে বলছে : আমাদের ধরো। মহাসর্বনাশ একটা ঘটতে চলেছে বলে যদিও মনে হচ্ছে, তেমন কিছুই নয় ব্যাপারটা। বাচ্চারা আনন্দে চীৎকার করছে। হাসছে। ভয় পাওয়ার নেই কিছুই।